ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ: ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ভিত নাড়িয়ে দেয়া এক আন্দোলন

১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধে নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার পতনের পর ভারতীয় উপমহাদেশে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনের সূচনা ঘটে। এর কয়েক বছর পরেই বাংলাতে এক ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন গড়ে ওঠে যা ব্রিটিশ সরকারকে অনেকটাই চিন্তিত করে তোলে। কাগজে-কলমে এই বিদ্রোহকে 'ফকির-সন্ন্যাসী আন্দোলন' নামে অভিহিত করা হয়। এই আন্দোলনে যুক্ত হয়েছিলেন প্রায় ৫০ হাজারেরও অধিক সন্ন্যাসী, ফকির, কৃষক এবং সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ। প্রায় ১৮০০ সাল পর্যন্ত চলেছিল এই আন্দোলন। কিন্তু কীভাবে এই আন্দোলনের সূত্রপাত এবং কী হয়েছিল এর পরিণতি তা ফুটিয়ে তোলাই আজকের লেখার অভিপ্রায়।

শিল্পীর তুলিতে ফকির সন্ন্যাসী বিদ্রোহ; Image Source: kanakpkfolk.info

ফকির-সন্ন্যাসী আন্দোলন সম্পর্কে জানার পূর্বে আমাদের ফকির ও সন্ন্যাসী সম্পর্কে একটু ধারণা রাখা প্রয়োজন। বর্তমানে ফকির-সন্ন্যাসী বলতে আমরা যাদের বুঝি, অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রেক্ষাপটে তারা ছিলেন একটু ভিন্ন। এই আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী ফকিরেরা ছিলেন মাদারিয়া সুফি তরিকার অনুসারী। সতেরো শতকের শেষার্ধে শাহ সুলতান সুরীয়া বুরহানার নেতৃত্বে এই সুফিরা বাংলায় বেশ প্রসার লাভ করে। অন্যদিকে সন্ন্যাসীরা ছিলেন বেদান্তীয় হিন্দু যোগী। এই সকল ফকির ও সন্ন্যাসীদের ধর্মীয় আচারআচরণ এবং আনুষ্ঠানিকতায় অনেক সামঞ্জস্য লক্ষ্য করা যায়।

ফকির সন্ন্যাসীদের এই বিদ্রোহের মূল আহবায়ক ছিলেন মাদারিয়া তরিকার সুফিসাধক মজনু শাহ। এই বিদ্রোহের নেতৃত্বে মজনু শাহের খলিফা ছিলেন সুফিসাধক মুসা শাহ, চেরাগ আলী শাহ, সোবহান শাহ, করিম শাহ এবং আরো অনেকে। পরবর্তীতে এই বিদ্রোহের সাথে ভোজপুরী ব্রাহ্মণ ভবানী পাঠক, দেবী চৌধুরানীসহ আরো অনেকে জড়িত হতে থাকেন। বাংলায় দিনাজপুর, রংপুর, বগুড়া, মালদা, কোচবিহারসহ বাংলার বিভিন্ন জায়গায় এই আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করেছিল। এছাড়াও বিহারের পাশাপাশি উত্তর প্রদেশ, নেপাল ও আসামসহ বিভিন্ন জায়গায় এই বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে।

ফকির সন্ন্যাসী বিদ্রোহ; Image Source: riverbendrestoration.us

ফকির-সন্ন্যাসী আন্দোলনের পটভূমি অনেকটাই বিস্তৃত। ফকির এবং সন্ন্যাসীদের জীবন ছিল সাধারণ মানুষের চাইতে ভিন্ন। তাদের অনেকেই জীবনযাপন করতেন দান এবং ভিক্ষার উপর। এছাড়াও অধিকাংশ ফকির ও সন্ন্যাসীরা লাঠি, বল্লম ও ছোরা জাতীয় অস্ত্র সাথে রাখতেন। পাশাপাশি এই ফকির-সন্ন্যাসীরা দলবদ্ধভাবে থাকতেন। এর ফলে কোম্পানি শাসকদের চোখে ফকির-সন্ন্যাসীদের এসব কার্যকলাপ মোটেই মনঃপুত হলো না। ফকির-সন্ন্যাসীরা তখন ছিল কোম্পানি শাসকদের আয়ত্তের বাইরে। সেই কারণে এই সকল গোষ্ঠীকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্যে বিভিন্ন পরিকল্পনা করতে থাকে ব্রিটিশরা।

১৭৬৫ সালের দিকে কোম্পানি বাংলা ও বিহারের দেওয়ানি বা রাজস্ব সংগ্রহ শুরু করে। ফলে কোম্পানির চোখে ফকির-সন্ন্যাসীদের দান গ্রহণ অবৈধ হয়ে পড়ে। তাই তারা জনসাধারণের নিকট থেকে কোম্পানি কর্তৃক অননুমোদিত অর্থ আদায়ের উপর নিষেধাজ্ঞা প্রয়োগ করে। অন্যদিকে ফকির সন্ন্যাসীদের অবাধ চলাচলের

উপরেও কোম্পানির নজরদারি বাড়ানো হয়। কোম্পানি কর্তৃক নতুন ভূমি আইনের ফলে ফকির-সন্ন্যাসীরা আর যেখানে-সেখানে নিজেদের বসতি গড়তে পারছিলেন না। এর ফলে ফকির-সন্ন্যাসীদের দেয়ালে পিঠ ঠেকে যায়। ফলে তারা কোম্পানির শাসকদের বিরুদ্ধে বিভিন্নভাবে সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তুলতে শুরু করে।

ছোট ছোট বিদ্রোহ থেকে বিভিন্ন জায়গার ফকির সন্ন্যাসীরা একত্রিত হতে থাকে এবং বিদ্রোহ পূর্ণরূপ ধারণ করতে থাকে। বিদ্রোহীদের প্রধান লক্ষ্যস্থল হয়ে দাঁড়ায় কোম্পানির বিভিন্ন কুঠি, জমিদারদের কাচারি ও কোম্পানি শাসকদের আবাসস্থল। বিদ্রোহে সাধারণত লাঠি, বর্শা, বল্লম, আগুন নিক্ষেপণ বারুদ ও বিভিন্ন হাতে তৈরি অস্ত্র ব্যবহৃত হতো।

ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের ছবি; Image Source: yourstory.com

ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের কথা আমরা অনেকেই জানি। বাংলা ১১৭৬ (ইংরেজি ১৭৭০) এ বাংলার বুকে এই দুর্ভিক্ষ হয়েছিল বলে একে ছিয়াত্তরের মন্বন্তর বলা হয়। ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহে ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। এই দুর্ভিক্ষের সময় অসংখ্য গরীব কৃষক মারা যায়। গৃহহীন হয়ে পড়ে হাজার হাজার মানুষ। এ সময় সাধারণ জনগণ এবং কৃষক শ্রেণী একত্র হয়ে ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে। ফলে এই বিদ্রোহের বিস্তৃতি ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে।

১৭৭২ সালে ওয়ারেন হেস্টিংসকে ভারতের প্রথম গভর্নর জেনারেল হিসেবে প্রত্যক্ষভাবে শাসনকার্যের ভার তুলে দেয়া হয়। হেস্টিংস তখন কঠিন সব নীতি নির্ধারণ করতে থাকেন। যেকোনো বিদ্রোহ বা অনৈতিক কর্মকান্ড কঠোর হাতে দমন করা হবে বলে ঘোষণা দেন। এছাড়াও ফকির বা সন্ন্যাসীদের কোনো প্রকার অস্ত্র বহন করার উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন। এই ধরনের দমন নীতির কারণে ফকির-সন্ন্যাসীসহ সাধারণ মানুষেরা আরো বেশি ক্রুদ্ধ হয়ে পড়ে। ফলশ্রুতিতে আন্দোলন আরো বেশি জোরালো হতে থাকে।

ওয়ারেন হেস্টিংস; Image Source: onushilon.org

এই বিদ্রোহের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনার মধ্যে ১৭৬৩ খ্রিস্টাব্দে দিনহাটার রামানন্দ গোঁসাইয়ের বাহিনীর সঙ্গে ইংরেজ লেফটেন্যান্ট মরিসনের যুদ্ধ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৭৬৯ খ্রিস্টাব্দে নেপাল সীমান্তে ইংরেজ

সেনাপতি কিথকে হত্যা করে বিদ্রোহীরা। ১৭৭৩ খ্রিস্টাব্দে রংপুরে ক্যাপ্টেন টমাস নিহত হন সন্ন্যাস-ফকিরদের অতর্কিত আক্রমণে।

তবে এই ফকির-সন্ন্যাস আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন মজনু শাহ। তার নেতৃত্বেই মূলত ইংরেজদের বিরুদ্ধে সুসংগঠিত আন্দোলন শুরু হয়। তিনি প্রথম অনুধাবন করেন এই সংগ্রামে সকল ধর্মমত নির্বিশেষে সকল মানুষকে একত্রিত করতে হবে। তিনি প্রথমে সুফি দরবেশ ও যোগী সন্ন্যাসীদের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করেন। তিনি অবিরাম বিহারের পশ্চিমাঞ্চল থেকে বাংলার পূর্বপ্রান্ত পর্যন্ত অসংখ্যবার ফকির ও সন্নাসীদের একত্রিত করার জন্য ঘুরে বেড়ান। এর পাশাপাশি তিনি বিভিন্ন পেশাজীবী মহল ও সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন লাভ করেন।

দীর্ঘ ২৬ বছর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সাথে ছোট-বড় বিভিন্ন যুদ্ধে মজনু শাহ নেতৃত্ব দেন। তার সুদক্ষ যুদ্ধ পরিচালনায় বাংলার বিভিন্ন স্থানে সফল অভিযান পরিচালনা করেন। এসব অভিযানের মাধ্যমে তিনি কোম্পানির বিভিন্ন কুঠি থেকে অর্থ, অস্ত্র ও অন্যান্য হরেক ধরনের জিনিসপত্র লুট করে নিতে সক্ষম হন। ব্রিটিশ শাসকরা তখন তাকে তন্নতন্ন করে খুঁজতে থাকে; এমনকি তাকে ধরিয়ে দেয়ার জন্যে অনেক টাকা পুরস্কার পর্যন্ত ঘোষণা করে।

মজনু শাহ; Image Source: banglapedia.org

১৭৮৬ সালের দিকে ময়মনসিংহে কালেশ্বর এলাকায় এক অভিযানের সময় লেফটেন্যান্ট ব্রেনানের কাছে পরাজিত হন এবং ভীষণভাবে আহত হন। সেখান থেকে কোনপ্রকারে পালিয়ে মজনু শাহ বিহারে চলে যান। এর দুই বছর পরেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন। মজনু শাহের মৃত্যুর পর তার ভ্রাতুষ্পুত্র মুসা শাহ কিছু বছর ফকির-সন্ন্যাসীদের নেতৃত্ব দেন। কিন্তু মজনু শাহের পরাক্রমশীলতা এবং যুদ্ধনীতি তার ছিল না। ১৭৯২ সালে

মুসা শাহের মৃত্যুর পরে এই আন্দোলনে ভাটা নেমে আসে। পরবর্তিতে চেরাগ আলী শাহ, সোবহান শাহ, করিম শাহ, রওশন শাহ, অনুপ নারায়ণ, শ্রীনিবাসসহ অনেকেই এই আন্দোলন অব্যাহত রাখার চেষ্টা করেন। ১৮১২ সালের পর থেকে ব্রিটিশ সরকার এই আন্দোলন পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসতে সক্ষম হয়।

ঐতিহাসিক বিবেচনায় এই আন্দোলনের অনেক ধরনের প্রেক্ষাপট রয়েছে। অনেক ব্রিটিশ লেখক, সাংবাদিক, অফিসার বিভিন্ন লেখায় এই আন্দোলনকে একটি জনবিচ্ছিন্ন, অযৌক্তিক ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী ডাকাত বলে অভিহিত করেছেন। আবার অনেক ঐতিহাসিক এই আন্দোলনকে ভারতের স্বাধিকার আন্দোলনের অন্যতম গণসংগ্রাম হিসেবেই আখ্যা দিয়েছেন। তবে যত মতই থাকুক, ঐতিহাসিক এই আন্দোলন ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে অন্যতম প্রেরণা জাগিয়েছে তা অনস্বীকার্য।